ধানমন্ডি

আবাসিক এলাকার বাণিজ্যিকীকরণ

লিখেছেন স্থপতি **শাহরিয়ার ইকবাল রাজ** ও **সাজিয়া আফরিন**

সিটি, মেগা সিটির মতো বিশাল বাস, অসংখ্য রিকশা আর প্রাইভেট কার, রাস্তা ভর্তি ব্যস্ত অফিসগামী মানুষের চলাচল- এটাই হচ্ছে বর্তমান ধানমন্ডির চলমান চিত্র। অনেক আগে 'সাপ্তাহিক ২০০০' ধানমন্ডি প্রসঙ্গে একটি লেখাতে লিখেছিল 'কাকডাকা ভোরের মতোই' প্রভাতে ধানমন্ডিতে ঘুম ভাঙে নির্মাণাধীন বিভিন্ন সাইটে রড, হাতুড়ি আর ইট ভাঙার শব্দে। এরপর কেটে গেছে প্রায় তিন বছর। এরই মধ্যে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য অ্যাপার্টমেন্ট আর নতুন বাড়ি।

গত কয়েক বছরে ধানমন্ডির মতো গুলশান আবাসিক এলাকার প্রেক্ষাপটও এভাবেই পাল্টে গেছে। সঙ্গত কারণেই প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব এলাকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহও পাল্টেছে সমান তালে। যেমন প্রভাতে লাল-সাদা অথবা নীল-সাদা পোশাকের ভিড় আর এর সঙ্গে কচিকণ্ঠের শব্দ বর্তমান ধানমন্ডির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ নগরী হয়ে উঠেছিল ১৬১০ সালে মুঘল রাজধানী স্থাপনের পর। তখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল জায়গা হিসেবে গণ্য হতো বুড়িগঙ্গার দু'পাড়। অথচ ১৯৫৬ সালে ডিআইটি ঢাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে যাতে বুড়িগঙ্গা নিয়ে কোনো নির্দেশনাই ছিল না। অবশ্য আবাসিক এলাকা হিসেবে গুলশান, ধানমন্ডির মতো এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তখন ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১ লাখ ২৫ হাজার। ধানমন্ডির মতো জায়গা আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিগণিত হলেও জীবন ধারণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র কিনতে হলে এ এলাকাবাসীদের শাহবাগ অথবা পুরান ঢাকায় যেতে হতো।

আবাসিক এলাকার অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও প্রয়োজনীয় সার্ভিসের Proximity থাকতে হবে। আর সে কারণেই এ এলাকায় কিছু সাধারণ দোকানপাট নির্মাণ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে ধানমন্ডিতে আবাসিক স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল আবাসিক এলাকা হিসেবে ধানমন্ডিকে অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা এ রকম ধারণার ওপর ভিত্তি করেই সাত মসজিদ রোড, মিরপুর রোডের পাশের জায়গাগুলোতে কমার্শিয়াল ডেভেলপমেন্টের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। বর্তমান অপরিকল্পিত ও যানজটবহুল ধানমন্ডির 'উন্নয়নের' (?) বীজ এভাবেই রোপিত হয়েছিল।

উদাহরণ স্বরূপ, মাস্টার মাইন্ডের মতো অসংখ্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ধানমন্ডিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার প্রায় সবগুলোরই আবাসিক ভবনকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের কোনো অনুমোদন নেই। অবশ্য বিদ্যালয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় পড়ে কি না এ

জন্ম, সৃষ্টির লক্ষ্যে
শাহ্ সিমেন্ট

নিয়ে অনেকেরই মতৈক্য থাকতে পারে। আর সে ক্ষেত্রেও আবাসিক ভবনকে স্কুল হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদনও ডিআইটি অথবা সিটি কর্পোরেশন কখনোই ধানমন্ডি এলাকায় দিতে পারে না এবং দিচ্ছেও না। এক হিসাবে দেখা যায়, ধানমন্ডিতে স্কুল হিসেবে ব্যবহৃত আবাসিক বাড়ির সংখ্যা ১৪৮টি। এর মধ্যে অধিকাংশই ব্যবহার করছে CODA, SODA, UODA।

এ প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রী পরিবহন করার জন্য ছোট মাইক্রোবাস থেকে শুরু করে সিটি বাসের মতো বিশাল বাসও ব্যবহার করছে। যার ফলে ২৬ নম্বর (পুরনো) রোড থেকে শুরু করে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের রোড এবং তার পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ রাস্তাই

avbgwÛ‡Z GLb AmsL¨ ewYwR¨K feb

অপেক্ষমাণ বাস, মিনিবাস আর মাইক্রোবাসের ভিড় থাকে সারাদিনের অর্ধেকটা জুড়েই। এর ফলে ১০/এ থেকে শুরু করে টানা ২৭ নং রাস্তা পর্যন্ত প্রায়ই জ্যাম লেগে থাকে।

২০০৩ সালে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের একটি জরিপে দেখা যায়, ধানমন্ডিতে ৬টি প্রাইমারি স্কুল ও চারটি মাধ্যমিক স্কুলের বেশি প্রয়োজন নেই, সেখানে ধানমন্ডিতে আজ অগণিত স্কুল-কলেজ। আর এ থেকেই বোঝা যায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক সফলতা। ধানমন্ডির অধিকাংশ প্লটের আকারই ছিল এক বিঘা, যাতে খুব বেশি হলে

স্থাপত্য

পাতাল পথের গল্প

স্থপতি মাহফিল আলী

dg wn‡m‡e te‡Q tbqv n‡q‡Q g_

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পাতাল রেল, পাতাল পথ পুরনো বিষয়। কিন্তু আমাদের এখানে পাতাল পথের বিষয়টি এখনো নতুন। ১৯৯৭ সালে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা খরচে পাতাল পথের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সাত বছর ব্যবহারের পর পথের জীর্ণদশা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে এর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা ওঠে। বিশেষ করে বহিঃদৃশ্য এবং অভ্যন্তরের পরিবেশ নিয়ে ব্যবহারকারীদের অভিযোগের শেষ নেই। অতঃপর ঢাকা সিটি করপোরেশন সিদ্ধান্ত নেয়, এমনভাবে সংস্কার নকশা প্রণয়ন করা হোক যাতে নতুন পাতাল পথ সব সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। ঢাকা সিটি করপোরেশন তাদের চাহিদা অনুযায়ী ইনগ্রিড আর্কিটেক্টসকে এ কাজের কনসালটেন্ট এবং নির্মাণকাজের জন্য এসএস রহমান ইন্টারন্যাশনালকে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগদান করে।

নকশা প্রণয়ন : নকশা প্রণয়নে স্থপতিদের প্রধান চিন্তা ছিলো নগরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কে একটি আধুনিক ফর্ম তৈরি করা। মজার ব্যাপার হলো, প্রাকৃতিক একটি পোকার গড়ন থেকে এর ফর্ম নির্বাচন করা হয়েছে। মথের ধীরগতির ছন্দ স্থপতিদের সৃষ্টিশীল চিন্তায় প্রথম আলোড়ন তোলে। অতঃপর এমন একটি ফর্ম নির্বাচন করা হয় যা দেখে মনে হয় ব্যস্ত নাগরিক জীবনে, গতিশীল রাজপথে ধীরলয়ে এগিয়ে চলছে পাশাপাশি দুটি মথ।

ফর্ম নির্বাচন শেষে এর নির্মাণ কৌশল নিয়ে স্থপতিদের নতুন গবেষণা শুরু হয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত হয় গড়নটিকে এমনভাবে রূপদান করতে হবে যাতে কোনোভাবে এর ছন্দ এবং ঐক্যতান নষ্ট না হয়। আবার পাতাল পথের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের চলাচল থাকে। আর তাই সম্পূর্ণ ফর্মটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। মাঝের ঢালু পলিগনাল (Polygonal) ভল্টটি (Vault) হবে আলো প্রতিরোধক, এর দু'পাশের পলিগনাল ভল্ট দুটি হবে আলো প্রবেশে সহায়ক। আর মাঝের কংক্রিটের ভল্টের ওপর অ্যালুকোবন্ড ঢেকে এর গায়ে স্টেইনলেস স্টিলের বাঁকানো পাইপ দিয়ে মথের গায়ের শিড়দাঁড়াকে প্রকাশ করা হয়। আর অন্য দু'পাশের ভল্ট দুটি পলিকার্বনেট শিট দিয়ে ঢেকে এবং স্টেইনলেস স্টিলের পাইপ দিয়ে এর গায়ে শিরদাঁড়ার ভাব নিয়ে আসা হয়। পাতাল পথের অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সেখানে কৃত্রিম আলো না থাকলেও দিনের বেলা প্রাকৃতিক আলোতেই মানুষ সহজে চলাচল করতে পারছে। তারপরও রাতের কথা ভেবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আইপিএস (IPS) সংযোজনের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। খোলামেলা নকশায় বাতাস চলাচল প্রচুর, তবু এক্সাস্ট (Exhaust) ফ্যানের মাধ্যমে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। পানি নিষ্কাশনের জন্য পাম্প এবং পাইপের ব্যবস্থা আছে। দেয়াল এবং সিঁড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাইলস লাগানো হয়েছে যাতে সহজে ময়লা পরিষ্কার করে ফেলা যায়। সিঁড়িতে এসএস পাইপের রেলিং থাকায় বয়োবৃদ্ধদের চলাচল সুগম হয়েছে এবং আগের মতো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আর নেই। পাতাল পথের টানেলে স্পট লাইট এবং গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের পেইন্টিং পথচারীদের যথেষ্ট চিত্তবিনোদন দিতে পারছে।

জন্ম, সৃষ্টির লক্ষ্যে

শাহ সিমেন্ট

তিন তলা বাড়ি করতেন জমির মালিকরা। এর অর্ধেকটাই বাগানের জন্য ছেড়ে দেয়া হতো। বাগানকে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যায় বলেই স্কুল হিসেবে এ ধরনের বাড়িগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ধানমন্ডিতে মূলত কিন্ডার গার্টেন অথবা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলই বেশি। কারণ হিসেবে জানা যায়, এ ধরনের স্কুল করতে সরকারি কোনো লাইসেন্স লাগতো না। অবশ্য সম্প্রতি এ ধারণার পরিবর্তন সরকারি পর্যায়ে উপলব্ধি হচ্ছে। এছাড়াও সাধারণ বাড়ি ভাড়ার চাইতে স্কুল হিসেবে ভাড়া দিলে ভাড়াও বেশি পাওয়া যায় বলেই অধিকাংশ বাড়ির মালিকই তাতে আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন।

ধানমন্ডিতে স্কুলের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে হাসপাতাল, ক্লিনিক, অফিস এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ধানমন্ডিতে ৪৮টি ভবন ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ক্লিনিক ও নার্সিং হোম হিসেবে। এর মধ্যে কেবল বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজেরই সঠিক অনুমোদন আছে। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের প্ল্যানে কার পার্কিংয়ের জন্য কয়েক লেয়ার বিশিষ্ট পার্কিং দেখানো হলেও কার্যত সেখানে আছে মাত্র একটি লেয়ারের পার্কিং, তাও আবার অর্ধেকটাই বিভিন্ন ওষুধের দোকানের দখলে। প্রতিদিন সকালে এই মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের গাড়ির ও রোগীর গাড়ির ভিড় ২৫ (পুরনো) নম্বর রাস্তায় তৈরি করছে ট্রাফিক জ্যাম। সাত মসজিদ রোড থেকে রাইফেলস্ স্কয়ারগামী রাস্তায় যেসব গাড়ি চলাচল করে তার সবকটিকেই ১০-১৫ মিনিটের মতো ২৫ নম্বর রাস্তার মোড়ে সৃষ্ট 'বটল নেকিং'-এর কারণে জ্যামে আটকে থাকতে হয়। যদিও বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২৫ নম্বর রাস্তাটিকে সকালে ওয়ান ওয়ে করে দেয়া হয়।

ঢাকার অনেক রাস্তাকে রিকশামুক্ত করা হলেও সাত মসজিদ রোড থেকে গেছে এই আওতার বাইরে। অপরদিকে মিরপুর রোডে রিকশা চলাচলে বাধা আছে। আর তাই কলাবাগান অথবা সোবহানবাগ এলাকার ভেতরে চলাচলকারী রিকশাগুলো যখন ধানমন্ডিতে প্রবেশ করতে চায় তখন একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিতে হয় ৮ নম্বর ব্রিজ সংযুক্ত লেকের পাড়ের রাস্তাটি। ফলে দিনের বিভিন্ন সময় ৮ নম্বর ব্রিজের মোড়ে জ্যাম লেগে যায়। অপর দিকে সেন্ট্রাল রোড ও গ্রিন রোড থেকে যেসব রিকশা ধানমন্ডি এলাকায় প্রবেশ করতে চায় তারা বেছে নেয় ধানমন্ডি ৪-এর সঙ্গে মিরপুর রাস্তা ক্রস করে ধানমন্ডিতে ৬-এ প্রবেশের পথ। এ রাস্তাগুলোতেও দেখা যায় দিনের বিভিন্ন সময়

ewYiR¨K e¨envi‡ii Kvi‡YB hvbRU m„ó

বিশৃঙ্খলতার কারণে জ্যাম লেগে থাকে।

বর্তমান ধানমন্ডির সবচাইতে বড় সমস্যা হলো উন্মুক্ত ফুটপাতের অভাব এবং জানজট। সাত মসজিদ রোডের বাসিন্দা তানিয়া ২০০০কে বলেন, 'তার বাসা থেকে সিটি কলেজ পর্যন্ত যেতে সময় লাগে আধঘন্টা। অফিস টাইমে যানজট সমস্যা প্রকট হয়ে থাকে। এ ছাড়া নতুন করে যোগ হয়েছে নিত্যনতুন ইউনিভার্সিটির ভিড়। সাত মসজিদ রোডের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কমপক্ষে পাঁচটি ইউনিভার্সিটি, যেগুলোতে আবার রয়েছে একাধিক ক্যাম্পাস।

ক্ষোভ প্রকাশ করে তানিয়া ২০০০কে আরো বলেন, 'আমার বাসার চারপাশে অ্যাপার্টমেন্ট, অনেক বুটিক শপ, অসংখ্য খাবারের দোকান, যেখানে বাগানসহ কোনো বাড়ি নেই। এখন ধানমন্ডিকে আমরা শপিং মলের এরিয়াও বলে থাকি। যেখানে কাঁচা মাছ থেকে শুরু করে ভাজা মাছ সবই পাওয়া যাবে।'

বিগত সরকারের সময় ধানমন্ডি লেকের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়, যার ফলে ধানমন্ডির জমির বাণিজ্যিক মূল্যও অনেক বেড়ে যায়। ফলে অ্যাপার্টমেন্ট ডেভেলপাররা সহজেই আকৃষ্ট হন ধানমন্ডির জায়গার প্রতি। বছর তিন-চার আগেও যেখানে প্রতি অ্যাপার্টমেন্টের স্কয়ার ফিটের মূল্য ছিল ১৫০০-১৭০০ টাকা, সেখানে বর্তমান মূল্য হয়েছে ২৫০০-৩০০০ টাকা। আর লেক পাড়ে হলে এর মূল্য আরো বেড়ে যায়। এর ফলে বাণিজ্যিকভাবে পুরনো জমির মালিকরা হচ্ছেন লাভবান।

- ধানমন্ডির পরিবেশ উন্নয়ন জোটের সুলতানা আলম বলেন, 'মুক্ত মঞ্চ তৈরি অথবা ব্যবহারের কোনো ধারণা ছাড়াই ধানমন্ডিতে তৈরি হয়েছে মুক্ত মঞ্চ। এই মঞ্চের জন্য সভা-সমিতির অতিরিক্ত হৈ চৈ লেগেই রয়েছে। এ কারণে পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলোতে বসবাস ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, আবাসিক ভবনকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করলেও কেউ এখানে বাণিজ্যিক হারে বিদ্যুৎ, পানি অথবা গ্যাসের বিল দেন না। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি থেকেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ধানমন্ডিতে ট্রেড লাইসেন্স দেয়নি। ফলে পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই বেআইনিভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সময় অন্য জায়গার ঠিকানা ব্যবহার করা হয়।

এতো অফিস আর কমার্শিয়াল ডেভেলপমেন্টের কারণে ধানমন্ডির প্রায় সব রাস্তাঘাটেই অসংখ্য চায়ের দোকান ছাপড়ার মতো গড়ে উঠেছে।

আর তাই ধানমন্ডিবাসী মিসেস শিরিনা বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেরোতে পারে না। টিটকারী, নোংরা রাস্তা, ভাঙা ফুটপাত, ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচাইতে বেশি যেটি বেড়েছে তা হচ্ছে ড্রাগসসেবীদের আস্তানা।'

ধানমন্ডির তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে যদি আমরা উত্তরার দিকে তাকাই তাহলে সত্যি অবাক হতে হয়। খুব পরিকল্পিতভাবেই গড়ে উঠছে উত্তরা, যেখানে বাণিজ্যিক ভবন ও আবাসিক ভবন ওভারল্যাপ হয়ে হ য ব র ল অবস্থার তৈরি করেনি।

ধানমন্ডি উন্নয়ন জোট (ধাপউজ) ধানমন্ডিতে সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে এ ব্যাপারে সরকারি পর্যায়ের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা। প্রাথমিকভাবে ৮ নম্বরসহ বিভিন্ন ব্যস্ত চৌরাস্তায় অবশ্যই ট্রাফিক বাতির ব্যবস্থা করতে হবে। আর সাধারণ নাগরিকদের আইন মেনের চলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অবৈধ বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং ভবনের পার্কিং ফ্যাসিলিটি নিশ্চিত করতে হবে।

জমি অথবা তৈরি বাড়ি হয়তো প্রতিটি মানুষেরই স্বপ্ন। প্রতিটি জমি ও প্রতিটি বাড়িই একটি পরিবেশের অংশ। যদি আমাদের নাগরিক ভাবি তাহলে পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদেরই। বর্তমানে ধানমন্ডির মতো অনেক আবাসিক এলাকারই বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়েছে। সঠিক সময়ে পরিকল্পনা যথাযথ প্রয়োগ করা না হলে ঢাকা অচিরেই হারাবে তার সৌন্দর্য ও আবাসযোগ্যতা। এই উপলব্ধির পাশাপাশি নির্দিষ্ট মহলকে বুঝতে হবে বিডিআর, ক্যান্টনমেন্টের মতো স্থাপনা ঢাকার মতো ব্যস্ত নগরীর ভেতরে হবার যৌক্তিকতা কতখানি! শহর মূলত সাধারণ নাগরিকদের জন্য, সামরিক স্থাপনার জন্য নয়।

ছবি : **সালাউদ্দিন টিটু ও সোহেল রানা রিপন**